অধ্যায় ৯: শোলা ও কুসুমশিল্প, মালা, আলপনা ও পটশিল্প এবং পৌরাণিক চিত্রকলা

মধ্যযুগে পল্লী শিল্পীদের সৃষ্ট লোকশিল্পেই লোকসমষ্টির প্রয়োজন দূর হত। সেকালে দেশীয় শিল্পীদের সর্বনাশ সাধিত হয় নি। সেই সুদূর মধ্যযুগে আধুনিক কালের প্রলেপ পড়েনি বাংলার লোকশিল্পে। পরস্পর ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ লোকসমষ্টিই ছিল লোকশিল্পীদের রক্ষক এবং বাহক। কবিকঙ্কণের কালে মধ্যযুগের বাংলাদেশে স্বতঃস্ফূর্ত অবাধ বাণিজ্য ছিল না। ইংরেজদের সঙ্গে বাঙালির সেভাবে পরিচয় ঘটেনি। সুতরাং বিদেশী শিল্পে বাংলাদেশের ঘর বাহির ভরে যায়নি। গৃহস্থকে গ্রাম্য শিল্পীরাই প্রয়োজনীয় শিল্পের যোগান দিতেন। প্রয়োজনের সঙ্গে সৌন্দর্য, দেববাদ ও পুরাণ প্রবণতা ভারতীয় শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ দিক। শিল্পীরাই তাদের সৃষ্ট শিল্পবস্তু দিয়ে গৃহস্থদের অভাব পূরণ করতেন। অনেক সময় নির্দিষ্ট শিল্পীরা পাড়ায় পাড়ায় তাদের শিল্পবস্তু নির্দিষ্ট গৃহস্থকে দিতেন। বিশেষত শোলাশিল্পীরা, কুসুমশিল্পীরা এবং মালাকারেরা তাদের সৃষ্ট শিল্প গ্রামের পূজা–পার্বণে, গৃহস্থের বাড়ীতে বাড়ীতে যথাসময়ে পৌঁছে দিতেন। লোকসম্প্রদায়ভুক্ত শিল্পীরা কেউই নিজেদের বৃত্তি ত্যাগ করতেন না। অনেকক্ষেত্রে গৃহস্থ শিল্পীদের আগাম অর্থ দিয়ে রাখতেন। একে দাদন বলা হত। এছাড়া পুরোহিত, ব্রাহ্মণ এবং গুরুকে নারায়ণ শিলা 'নির্মাল্য' দাদন রূপে দেওয়া হত। আর কখনো কখনো সাধারণ গৃহস্থ 'সিধা' দিয়ে শিল্পীদের সম্মান করতেন। এও এক প্রকার দাদন।

মধ্যযুগে মালী এবং মালাকার সম্প্রদায়ভুক্ত শিল্পীরা গৃহস্থের বাড়ীতে বাড়ীতে ফুলের শিল্প সামগ্রী নিয়মিত যোগান দিতেন। আর মালাকারেরা দেব দেবীর পুজোতে চাঁদমালা টোপর প্রভৃতি তৈরী করতেন। মধ্যযুগে রাজবাড়ীতে, সম্পন্ন গৃহস্থ বাড়ীতে এবং অভিজাত ভূস্বামীদের বাড়ীতে মালাকারেরা শোলার শিল্প সামগ্রী তৈরী করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। উৎসব অনুষ্ঠানে শোলা এবং ফুলের উপকরণে সৃষ্ট শিল্প খুবই আদরণীয় হত। লোকায়ত প্রথা, আচার–অনুষ্ঠান, মন্ত্র–তন্ত্র, পূজা-পার্বণ এবং বিবাহে নিত্য দিনের শিল্পসামগ্রী রূপে শোলাশিল্পের গুরুত্ব সমগ্র মধ্যযুগ জুড়েই ছিল। শুধু প্রয়োজন নয়, শোলা দিয়েই পূজা–পার্বণ এবং মণ্ডপের সৌন্দর্য–সৌধ রচনা করতেন শিল্পীরা। বংশ পরম্পরায় উত্তরাধিকার সূত্রে শিল্পীরা এই দৃষ্টিনন্দন শিল্পকাজটি অধিগত করেছিলেন। ঐতিহ্য মালাকারদের শিল্প সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছিল। শোলা দিয়ে কত শিল্পই না তৈরী

করা যায়। শোলার ফুলঘর, মউড়, চূড়া, টোপর, চাঁদমালা, নানা রকমের খেলনা, টিয়াপাখি, কাকাতুয়া, ঝাঁকপাখি, হনুমান, মাছরাঙা, ময়ূর, হাতি, ঘোড়া, পাখি, পুতুল, দেবদেবীর মূর্তি, পট, কনের মাথার সিঁথি প্রভৃতি নানা বর্ণময় শিল্পের অনুসন্ধান করা যায় মালাকারদের সৃষ্ট শোলার কাজের মধ্য দিয়ে। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ফুলঘর, টোপর, মউড় (মুকুট), চূড়া প্রভৃতি শোলাশিল্পের উল্লেখ এসেছে।

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য কুসুমশিল্পের আঁতুড়ঘর। এককথায় কুসুমশিল্প বঙ্গ রমণীদের একচেটিয়া শিল্পকলা। মালাকার সম্প্রদায়ের রমণীদের শিল্প প্রতিভার স্ফুরণ কুসুমশিল্পে সর্বোচ্চ সীমানা স্পর্শ করেছিল। মধ্যযুগে বঙ্গ রমণীদের এই শিল্পকলা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছিল। এই যুগে মালিনীদের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে হীরা মালিনীর উল্লেখ আছে। যিনি মালা তৈরীতে দক্ষ ছিলেন। নানা জাতের, নানা বর্ণের ফুল মালিনীদের কুসুম শিল্পের প্রধান উপকরণ। ফুলকে নানা বিন্যাসে সুতো দিয়ে গেঁথে গেঁথে মালিনীরা মালা তৈরী করেন। পূজা–পার্বণ, আচার–অনুষ্ঠান, বার–ব্রত, মাঙ্গলিক ক্রিয়া কর্ম, নারীদেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি-সব কিছুতেই ফুলের কোনো বিকল্প নেই। তবে ফুল তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। যাকে বলে বাসি ফুল। এমন ফুল কোনো কাজে লাগে না। ভোরে ফুল তোলার সময় শিল্পীরা শুচিতা ও পবিত্রতা বজায় রাখেন। ফুল ক্ষণস্থায়ী বলে মালাকারেরা ফুলের বিকল্প হিসেবে কখনো কখনো শোলার শিল্প ব্যবহার করেন। প্রাকৃতিক উপকরণে সৌন্দর্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে ফুলের সত্যই কোনো বিকল্প নেই। অলংকরণ এবং সৌন্দর্যসজ্জার প্রধান উপকরণ ফুল। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের কাব্য ফুলের বর্ণনায় টইটম্বুর। কবির কাব্যে নানা জাতীয় মালার উপস্থিতি দেখা যাচ্ছে। মালা, ফুলমালা, বনফুলের মালা, ওড়ফুলের মালা, কুন্দফুলের মালা, পারিজাত মালা, গুঞ্জা মালা প্রভৃতি মুকুন্দরামের কাব্যে পাওয়া যাচ্ছে। বাংলাদেশের শিল্পকলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল পুরাণ প্রবণতা। নিজের প্রাণের দেব–দেবীকে পুষ্পমালায় অর্ঘ্য নিবেদন করে পূজা করেছে মানুষ। আবার মানুষ যখন দেবোপম হয়ে ওঠে, তখন লোকায়ত জনসমষ্টি তাকে মালা দিয়ে বরণ করেছে। মধ্যযুগে মানুষের দেবতা হয়ে ওঠার কাহিনী আমরা জানি। চৈতন্যদেব ছিলেন সাক্ষাৎ দেবতা। বাঙালি জাতি এবং বাংলাদেশের ইতিহাস–সংস্কৃতি নির্ণয় করতে হলে শোলাশিল্পী, মালি, মালিনী এবং মালাকারদের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস ও তাদের সৃষ্ট শিল্পচর্চা ছাড়া উপায় নেই। মুকুন্দরামের কাব্যে রয়েছে মালাকার সম্প্রদায়ের

সৃষ্ট শিল্পের সাহিত্যিক ব্যঞ্জনা। ভারতবর্ষ ধর্মপ্রাণ মানুষের আবাস স্থল। দেববাদে বিশ্বাসী গৃহস্থ, সংসার নিরাসক্ত, সংসার ত্যাগী সাধারণ সরল মানুষেরা গলায় ধারণ করেছেন তুলসীমালা এবং রুদ্রাক্ষমালা। দেব খণ্ডে এবং বণিক খণ্ডে নানা পৌরাণিক অনুষঙ্গে কাব্যে তুলসীমালা এবং রুদ্রাক্ষমালার উল্লেখ এসেছে। মধ্যযুগের ধর্মপ্রাণ বাঙালির বিশ্বাসের অধ্যায় রচনা করেছেন মুকুন্দরাম। মালাকারদের সৃষ্ট শিল্পকর্মকে সাহিত্যরূপ দিয়েছেন তিনি।

মুকুন্দরামের কাব্যে আলপনা, পট এবং পৌরাণিক প্রাচীন চিত্রকলার উল্লেখ আছে। বাংলার ধর্মপ্রাণ পল্লী রমণীরা বার-ব্রত, বিবাহ এবং মঙ্গল অনুষ্ঠানে আলপনা অঙ্কন করেন। এই আলপনা বাংলাদেশ এবং বাঙালির মূল্যবান সম্পদ। এগুলিকে জাতীয় সম্পদও বলা যায়। বাংলার পল্লী রমণীরা ঐতিহ্য এবং উত্তরাধিকারকে পাথেয় করে তাদের স্বাভাবিক শিল্প সৌন্দর্যের নিদর্শন রেখে গেছেন। আলপনা পল্লী রমণীর নিজস্ব ক্ষেত্র। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে আর্য এবং অনার্য এই দুই ধারার লোকচিত্রকলার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর, মাটির দেওয়াল, মন্দিরের দেওয়ালে পল্লী রমণীরা তাদের শিল্প চিহ্ন রেখে গেছেন। সহজাত শিল্পকলার যে চিরন্তন অনাবিল সৌন্দর্য বাংলার পল্লী শিল্পীরা রেখে গেছেন, তার তুলনা মেলা ভার। চালের পিটুলি ধোয়া জল দিয়ে আঙুলের বিন্যাসে পল্লী রমণীরা তাদের পার্থিব কামনা বাসনাকে শিল্পরূপ দিয়েছেন। মোটিফ, প্রতীক, রেখার সামান্য আঁচড়ে রঙীন বর্ণময় কারুকার্যে শিল্প সুন্দর করে পরিশীলিত করেছেন তাদের বাস্ত-ভিটে এবং চারপাশের পরিবেশকে। অনার্য চিত্রকলায়ও সাঁওতাল পল্লীতে মঙ্গল অনুষ্ঠান এবং বিবাহ উৎসবে আলপনা দেওয়ার রীতি প্রচলিত। মুকুন্দরাম ফুল্লরার বিবাহের শুভক্ষণে এমন আলপনাকে কাব্যে শিল্পরূপ দিয়েছেন। আলপনা দেওয়ার সময় রমণীরা নানা সংস্কার পালন করেন। শুচিতা বজায় রাখেন। সাধারণভাবে আলপনায় রমণীর স্বামী পুত্রের মঙ্গল কামনা, সংসারের কামনা,সম্পদের কামনা থাকে। কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলে উল্লিখিত আলপনায় পাষাণে পূজার পদ্ধতি লিখন, দেবদেবীর বাহনের চিত্র, দেবীর কাঁচলির চিত্র, পত্রিকার কলাগাছ অঙ্কন, পুতুল অঙ্কন এবং অষ্টদল পদ্মের আলপনার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। দেবীর কাঁচলিতে বিষ্ণুর বামন মূর্তি ধারণ, কৃষ্ণের কালীয় দমন খণ্ড, বৃন্দাবন খণ্ড প্রভৃতি আলপনা অঙ্কন করা হয়েছে। বণিক খণ্ডে লহনা বশীকরণ মন্ত্রের জন্য পত্রিকার কলাগাছ অঙ্কন করেছেন। পত্রিকার কলাগাছ উদ্ভিজ্জ যৌবনের প্রতীক।

বাংলার পটের মধ্যে রয়েছে বাঙালির ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার। বাংলার জাতীয় ঐতিহ্য যাত্রা, পাঁচালী, কথকতা এবং পৌরাণিক কাহিনীকে পটুয়ারা তাদের নিজস্ব রঙ তুলিতে চিরন্তন করে রাখতেন। রামায়ণ, মহাভারত, মঙ্গলগান, ভাগবতের কাহিনী, কৃষ্ণলীলা সবই প্রাচীন চিত্রকরেরা রঙে-রেখায় চিত্র ভাষায় রূপ দিয়েছিলেন -যা হল পট। পটুয়ারা পট তৈরী করেন, পটের গান করেন, পট দেখিয়ে জীবিকা অর্জন করেন। বংশানুক্রমে বাড়ী বাড়ী ঘুরে ঘুরে পটুয়ারা পট দেখান, পট বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। সাধারণ গৃহস্থ পট কেনেন। ব্রত-পার্বণ এবং গ্রামীণ মেলায় পট বিক্রি হত। এই পটের উপকরণ একেবারেই সাধারণ। পুরাতন ছেঁড়া কাপড়, পাতলা কাগজে ছবির জমি তৈরী করতেন শিল্পীরা। এরপর খড়ি মাটির প্রলেপ দিয়ে রঙ এবং তুলির টানে চিত্ররেখা সম্পূর্ণ করতেন শিল্পীরা। গিরিমাটি, খড়িমাটি, প্রদীপের শিখার কালো রঙ, ছাগল বিড়াল কাঠবিড়ালীর লোমের তুলি, তেঁতুল বিচি সেদ্ধ করে তার আঠা, বেলের আঠা, বাবলার আঠা দিয়ে পটুয়ারা পট তৈরী করতেন। ছবিতে রঙের সঙ্গে ডিমেরও ব্যবহার করতেন প্রাচীন পটুয়ারা। মধ্যযুগের বাংলার পট ছিল সরল, সেই সরলতা ছিল ভাবনায়, বিন্যাসে, রেখা ও চিত্রের স্বতঃস্ফূর্ত ঔদার্যে বাংলার পল্লী পরিবেশের মত, উদাত্ত ভাটিয়ালি, বাউল গানের মত। সরল বিশ্বাসী মানুষের দেববাদ বাংলার পটশিল্পে ভাষা পেয়েছে। পটুয়ারা শুধু হিন্দু ছিলেন না, এরা ছিলেন মুসলমানও। মুসলমান পটুয়ারা হিন্দুদের পুরাণ বিষয়ক পট আঁকতেন। মুসলমানি পটের বিষয় ছিল সত্যপীরের পট এবং গাজির পট। পটের গান বংশপরম্পরায় বাহিত হয়ে আসত। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে পটকে কাঠিতে গুটিয়ে রাখা হত। পটুয়ারা পটের বিষয় সুর করে গাইতেন। সেই পটের গান শুনে পল্লী বাংলার ছেলে বউ বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এবং লোকায়ত মানুষ ভিড় করতেন। আর জড়ানো পটের ছবিগুলি পরপর খুলে দেখাতেন পটুয়ারা। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম জঙ্গল কেটে গুজরাট নগরে গড়ে ওঠা নতুন জনপদে, নগরে নগরে পট নিয়ে পটুয়াদের জীবিকা অর্জনের কথা বলেছেন।

বাংলাদেশ উর্বর কাদামাটি বা পলিমাটির দেশ। নিম্ন জলাভূমিতে একজাতীয় জলজ উদ্ভিদ পাওয়া যায়, তা হল শোলা গাছ।শোলা শিল্পের প্রধান উপকরণ হল শোলা। শোলা গাছের নানা প্রজাতি থাকলেও ফুল শোলা বা ভাত শোলাই হল এই শিল্পের প্রধান উপকরণ। শোলাশিল্পীরা মালাকার সম্প্রদায়ভুক্ত। এছাড়া শোলা শিল্পীদের মালী নামেও অভিহিত করা হয়।শোলা দিয়ে নানা কারু শিল্প প্রস্তুত করা হয়। টোপর চাঁদমালা মুকুট শিশুদের খেলনা পূজার সাজ প্রভৃতি কারুশিল্পের প্রধান উপকরণ মূলত শোলা।

নানা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে,আচারে- সংস্কারে, দেবদেবীর মূর্তিতে, পূজার সাজে, বিবাহ অনুষ্ঠানে, খেলনা নির্মাণে শোলার ব্যবহার হয়। হীরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর "বাংলার লোক-উৎসব ও লোকশিল্প" গ্রন্থে লিখেছেন- "শোলার সাজে বাংলার শিল্পীর যে ভাবুকতা, শিল্পচাতুর্য, নয়নাভিরাম সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রেরণা রয়েছে, আধুনিক সাজসজ্জাতে তার সন্ধান নেই বললেই চলে"।[১]

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে শোলাশিল্পের মধ্যে ফুলঘর, মউড়, টোপর, চূড়া প্রভৃতি লোকশিল্পের উল্লেখ এসেছে। নিম্নে এই শিল্পগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হল-

ক) **ফুলঘর,মউড়** : - ফুলঘর শোলার নির্মিত এক চমৎকার কারুশিল্প। ফুলঘর পূজা অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়। মালাকার বা মালিরা ফুল দিয়ে বিশেষ আকৃতির ফুলঘর তৈরি করেন।কালকেতুর গুজরাট নগরে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে মালাকার সম্প্রদায়ের শিল্পীরাও বসতি স্থাপন করেছেন। মালাকার সম্প্রদায়ের মানুষেরাও এসেছেন। মালি তৈরী করেছেন মালা,মউড় এবং ফুলঘর। বিবাহ অনুষ্ঠানে কন্যার মাথায় যে মুকুট থাকে তা হল মউড়।কবিকঙ্কণ লিখেছেন-

"মালী বৈসে গুজরাটে মালঞ্চে সদাই খাটে

মালা মউড় গড়ে ফুলঘর

ফুলের পুটলি বান্ধে সাজি দণ্ড করি কান্ধে

ফিরে তারা নগরে নগর"।[২]

কবিকঙ্কণ বণিক খণ্ডে প্রেতের হাটের পরিচয় দিয়েছেন।বাস্তবে প্রেতের হাট বলে কিছু হয় না। শিল্প মানুষেরই সৃষ্টি। আকাশ থেকে অলৌকিকভাবে শিল্প পড়ে না। প্রেতেরা ফুলঘর তৈরি করতে পারে না।অ-শিল্পকে কবি চিহ্নিত করেছেন।শিল্পের মধ্যে থাকে সৌন্দর্য। সমাজে ভূতের ধারণা ছিল। সৌন্দর্যহীনতার প্রকাশ ভূতেদের সৃষ্টি। কবিকঙ্কণ লিখেছেন–

"ফুলঘরা ওড় ফুল মালার লক্ষেক মূল

দন্ত কাটি গাঁথে কুন্দমালা"।[৩]

লোকায়ত মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মধ্যে আছে শিল্প, আছে সৌন্দর্য। সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর' 'শিল্পকলা' 'প্রবন্ধে লিখেছেন–"সুন্দরকে বিচ্ছিন্ন করিলে চলিবে না, তাহাকে আমাদের নিত্যব্যবহারিক শিল্পের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে; সুকুমার ও ব্যবহারিক শিল্পকলার যে প্রচলিত প্রভেদ তাহা আমাদিগকে ভুলিতে হইবে।"[৪]

টোপর,মুকুট,মউড় : - "টোপর জিনিষটার সঙ্গে বাঙালীর জীবন অদ্ভুতভাবে জড়িত।অন্নপ্রাশনে অনেকে টোপর ব্যবহার করে-চূড়োতে টোপর লাগে।.....বিয়ের ব্যাপারে তো নিশ্চয়ই।টোপরটা সম্পূর্ণ সোলা দিয়ে তৈরী-পাশে শুধু চাঁচারির ঘের থাকে...।লখিন্দরের টোপর নানা চিত্রে....." [৫] এঁকেছেন কাজলা মালিনী।

শোলা শিল্পীরা দম্পতির বিবাহের মুকুট তৈরী করেন। হিন্দুবিবাহ অনুষ্ঠানে মুকুট পরা আবশ্যক।মুকুটকে শুভ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের দ্যোতক ধরা হয়।মালাকার সম্প্রদায়ের শিল্পীরা শোলা দিয়ে এমন মুকুট তৈরী করেন। কন্যার টোপর যেমন মউড়, তেমনি বরের টোপর মুকুট। শুভ অনুষ্ঠানে বিশেষত বিবাহে এমন মুকুট পরেন সুসজ্জিত বর। মুকুটের কারুকার্যও অসাধারণ।হীরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর "বাংলার লোকউৎসব ও লোকশিল্প" গ্রন্থে লিখেছেন–"সৌন্দর্য পিপাসু বাঙালি শিল্পীর প্রতিভা এই বিদেশী জিনিসের অপেক্ষায় বসে থাকেনি। স্বভাবসিদ্ধ সৌন্দর্যসাধনার শক্তিবলে বাঙালি শিল্পী কলা-লক্ষ্মীকে প্রসন্ন করে তাঁর পদ্মচরণ সম্পাতে চিরদিনই আসামান্য সৃষ্টি করে তুলে ধরেছে তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে জড়িত সহস্র সামান্য বস্তু।"[৬]

কবিকঙ্কণের কাব্যে মুকুটের উল্লেখ এসেছে।দেবখণ্ডে দেব-দেবীর প্রসাধন সৌন্দর্যরূপে মুকুটের উল্লেখ করেছেন কবি–

"কনক কিঙ্কিনী হার দূর করে অন্ধকার

পুরটমুকুট মণিদাম"।[৭]

সাপের অলংকার পরেছেন দেবাদিদেব মহেশ্বর।গৌরীর সঙ্গে বিবাহে পরেছেন মুকুট– "মুকুট উপরে শোভে সুধাকর কলা"।[৮] দেবী চণ্ডীর কৃপায় অর্থলাভ করে কালকেতু গোলাহাট থেকে কিনেছেন মুক্তার চূড়া এবং নানা রত্নে ভূষিত মুকুট–

"চন্দন তরুর পিড়া লম্বিত মুকুতা চূড়া

কিনে দোলা রত্নে ভূষিত।.....

যুদ্ধের জিনিআ মর্ম অভেদ্য কিনিল বর্ম

নানারত্ন ভূষিত মুকুট"।[৯]

কালকেতু বীর। শোলার টোপর পরে বীরের সাজে সজ্জিত হয়ে সিংহল রাজের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন–

"শোলার টোপর শিরে ঘন সিংহনাদ পুরে

বাঁশে বান্দে চামর নিশান"।[১০]

শ্রীমন্তের বিবাহ সম্পূর্ণ হয়েছে। মুকুট মাথায় বসেছেন দম্পতি। চারিদিকে মঙ্গলবাদ্য।এমন টোপর প্রসঙ্গে কবিকঙ্কণ লিখেছেন–

"মাথায় মুকুট দিআ বসিল দম্পতি

কৌতুকে জৌতুক দেই জতেক যুবতী"।[১১]

বাংলাদেশের শুভ উৎসবের সঙ্গে লোকসম্প্রদায়ের গভীর সম্পর্ক। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'শুভ উৎসব' প্রবন্ধে লিখেছেন–"অন্তঃপুরে কুম্ভকারপত্নী নূতন বরণডালা সাজাইয়া আনিয়া দিত, মালিনী নিত্য নব নব ফুলভার যোগাইত এবং ফুলসজ্জার জন্য নূতন নূতন ফুলের গহনা প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিত,.....সকলেই যেন আত্মীয় পরিজনবর্গের মধ্যে–যেন একটি বৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবারের নানা অঙ্গ।"[১২]

চূড়া,মউড় : - এক প্রকার মস্তকাভরণ। মস্তকাভরণ অনেক। এগুলির মধ্যে বিভিন্ন নামের সোনা রূপার অলংকারই প্রধান। তবে চূড়া নানা প্রকার।বর কনের মাথার টোপরকে চূড়া বলা হয়। মন্দিরের চূড়া তৈরি করা হয়। নববিবাহিত বধূ মাথায় পরেন নানা অলংকার খচিত চূড়া।বর কনের মাথার চূড়া তৈরি করেন মালাকার সম্প্রদায়ের শিল্পীরা।রত্নালংকার তৈরি করেন স্যাকরা।চূড়াকে মউড় নামেও অভিহিত করা হয়। শোলা দিয়ে এমন টোপর তৈরি করেন মালাকারেরা। কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবী চণ্ডীর মন্দিরে অলংকার নির্মিত চূড়ার উল্লেখ করেছেন মুকুন্দরাম–

"হিরা নিলা মরকতে নির্মাইল চূড়া

রসান দর্পণ লাগে চারিদিকে বেড়া"।[১৩]

দেবী চণ্ডীর কৃপায় অর্থলাভ করে কালকেতু কিনেছেন অলংকার নির্মিত চূড়া। কবি লিখেছেন–

"চন্দন তরুর পিড়া লম্বিত মুকুতা চূড়া

কিনে দোলা রত্নে ভূষিত"।[১৪]

মালাকার সম্প্রদায়ের শিল্পকর্মের উল্লেখ করেছেন কবিকঙ্কণ–

"মালী বৈসে গুজরাটে মালঞ্চে সদাই খাটে

মালা মউড় গড়ে ফুলঘর"।[১৫]

শোলা কেটে মালাকারেরা তৈরী করেন শোলার মালা,মউড়, ফুলঘর,চাঁদমালা,চাঁদমুকুট, বরের টোপর,কনের মুকুট,পদ্মফুল, হাঁস,শাঁখ, কাকাতুয়া, টিয়াপাখি, কুমীর, হাতি, ঘোড়া প্রভৃতি। এছাড়া প্রতিমার সাজ তো আছেই।বাংলার সমাজ সংস্কৃতিতে একসময়ে মালাকার তথা শোলা শিল্পীদের ভূমিকা ছিল অনেক। পূজা-পার্বণে, সামাজিক অনুষ্ঠানে শোলা দিয়ে নানা ভাবে অলংকরণ করা হত। সেগুলো আর একালে নেই। মালাকার সম্প্রদায়ও বৃত্তি পরিবর্তন করেছে।প্রবালকান্তি হাজরা তাঁর 'গ্রামীণ জীবনরাগের ঝিলিক' গ্রন্থে লিখেছেন–"কিন্তু শোলা দুষ্প্রাপ্য হলে,শোলা শিল্পীদের যে দক্ষতার হাত শতশত বৎসর ধরে গড়ে উঠেছে,তা বিলীন হলে বাংলার গৌরবময় ঐতিহ্যেরই অপমৃত্যু ঘটবে।সে অন্তিম দশার প্রহর ঘনিয়ে আসতে, বিলম্ব নেই।[১৬]

কুসুমশিল্প: 'কুসুম' বা 'পুষ্প' প্রকৃতির বিস্ময়। মানুষ সংস্কৃত হয়েছে, ফুল দিয়ে শিল্প সৃষ্টি করেছে। দেবতাকে তুষ্ট করেছে ফুলের অঞ্জলি দিয়ে।যজ্ঞবেদীতে নিবেদন করেছে ফুলের অর্ঘ্য। সমাজে সৃষ্টি হয়েছে মালাকার সম্প্রদায়ের। বৃত্তি এবং সম্প্রদায় এক হয়ে গেছে।ফুলের বাগান পরিচর্যা করা, ফুলতোলা, মালা গাঁথা, ফুল এবং মালা সরবরাহ, মালাকার সম্প্রদায়ের বৃত্তি নির্ভর জীবিকা অর্জনের উপায়। মালি, মালিনী এই শিল্পকলার শিল্পী রূপে পরিচিত। কুসুম শিল্প মানুষের সৌন্দর্য চেতনার এক অনন্য প্রকাশ রূপ।মানুষ অন্যান্য প্রাণী থেকে পৃথক হয়েছে তার সৌন্দর্য পিপাসার জন্য।সৌন্দর্যসত্তা মানুষকে যথার্থ মানুষ হতে সাহায্য করেছে, তাকে শিল্প সুন্দর করেছে, চিরন্তন রূপ দান করেছে। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে দেখা যায়, আশ্রম নিবাসিনী শকুন্তলা ফুল পাতার আভরণে সেজেছেন। শুধু বন নিবাসিনী বা পল্লী রমণীরাই ফুলের শোভায় নিজেকে শোভিত করেননি,সেকালের বারবণিতারা ফুল দিয়ে নিজেদের শোভিত করেছেন।কত

রকমের ফুলের ব্যবহার এসেছে তা বলা কঠিন।বাঙালির পূজা-পার্বণ, বার-ব্রত, বিবাহ, আচার-অনুষ্ঠান এবং যে কোনো শুভ কর্মে ফুলের ব্যবহার হত।লোকশিল্পী ফুল দিয়ে চিরন্তন শিল্পকর্ম সৃষ্টি করেন।ফুল গেঁথে গেঁথে সুচ, সুতো এবং আঙুলের বিন্যাসে এমন চমৎকার শিল্পকলার কাজ করেন লোকশিল্পীরা।

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে মালাকার সম্প্রদায়ের পরিচয় পাওয়া গেছে।আর কাব্যে এসেছে নানা মালার সমাহার।আরণ্যক অনার্য রমণীরা ফুলমালায় শোভিত হতেন।আর্য রমণীরা পরতেন ফুলমালা।কাব্যে মালাকার সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন কবি–

"মালাকার আন্যা গলে দিল ওড়মাল

টিটিকারি দেই জয় নগরিআ ছাবাল"।[১৭]

কবিকঙ্কণের কাব্যে নিম্নলিখিতভাবে মালার উল্লেখ এসেছে–

১)ফুলমালা (পৃ:৩৫) ২)ফুলমালা (পৃ:৪৩) ৩)মালা (পৃ:৭৮) ৪)মালা (পৃ:৮২) ৫)বনমালা(পৃ:৮৪) ৬)পুষ্পমালা (পৃ:৮৭) ৭)মাল্য (মালা,পৃ:৮৭) ৮)মালা (পৃ:৯১) ৯)কণ্ঠমালা(পৃ:১০৩) ১০)ওড়মাল (জবা ফুলের মালা,পৃ:১০৬) ১১)ফুলমালা (পৃ:১২১) ১২)বনমালা (পৃ:১২৪,২বার উল্লিখিত) ১৩)কণ্ঠমালা (পৃ:১২৫) ১৪)কণ্ঠমালা (পৃ:১৫৭) ১৫)বনমালা (পৃ:১৭৫) ১৬)গুঞ্জমালা (পৃ:১৭৫) ১৭)মালা (পৃ:১৭৫) ১৮)মালা(পৃ:১৭৬-২ বার উল্লিখিত) ১৯)মালা (পৃ:১৭৯) ২০) কণ্ঠমালা (পৃ:১৯১) ২১)কণ্ঠমালা (পৃ:২১৩) ২২)বনমালা (পৃ:২২০) ২৩)পারিজাত মালা (পৃ:২৭১) ২৪)বনমালা (পৃ:২৭৪) ২৫)মালা(পৃ:২৭৬) ২৬)কুন্দমালা (পৃ:২৭৬) ২৭)কণ্ঠমালা (পৃ:২৯০) ২৮)কণ্ঠমালা (পৃ:৩০৩) ২৯)মালা (পৃ:৩০৯)।

(উপরিলিখিত লোকশিল্পের পৃষ্ঠা সংখ্যাগুলি তথ্যসূচীতে উল্লিখিত গ্রন্থে নির্দিষ্ট।)[১৮]

মুকুন্দরামের কাব্যে বনমালার উল্লেখই বেশি। নাম না জানা এমন অনেক ফুল দিয়ে গাঁথা হত মালা।এছাড়া কবিকঙ্কণের কাব্যে এসেছে গুঞ্জামালা ও পারিজাত ফুলের মালা।

কবিকঙ্কণ লিখেছেন-

"গোধূলি হইল বেলা চাপিয়া চলে দোলা

গলায় নাম্বে বনমালা"[১৯]

বণিকখণ্ডে শ্রীমন্তও বনমালা পরেছেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন-

"আজানুলম্বিত বনমাল"[২০]

আবার পারিজাত মালার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন মুকুন্দরাম।

কবিকঙ্কণ লিখেছেন-

"বিচিত্র পামরি গায় পারিজাতমালা

বৈরিবেশে ধায় পাইক জানে যুদ্ধকলা"[২১]

প্রাচীনকালে দেববিশ্বাস থেকে মানব সমাজে ফুল গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। মানুষের সৌন্দর্য ব্যাকুলতা কুসুমশিল্পে স্ফুটমান হয়। পরবর্তী সময়ে মানুষ যখন দেবোপম হয়ে ওঠে, তখন ফুল মানব পূজার বেদীতে অর্ঘ্য রূপে অর্পিত হয়। এছাড়া জীবন-মৃত্যুর ওঠাপড়া, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপে মালার ব্যবহার হয়। মালাকার সম্প্রদায় একালে গেছে হারিয়ে। তাদের শিল্পকলা আজ সংকটের মুখে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার, কৃত্রিম ফুলের আবিষ্কার কুসুম শিল্পের অপমৃত্যুকে ত্বরান্বিত করেছে।

সোমা শেঠ তাঁর"কুসুমশিল্প"প্রবন্ধে লিখেছেন -

"মানুষ বাধ্য হয়ে কৃত্রিম ফুলের ওপর নির্ভর করতে শিখেছে। বাজারে সিল্কের মোটা কাপড় কিংবা সিন্থেটিক কাপড় দিয়ে নানা রঙের ফুলপাতা ইত্যাদি তৈরি করা হয়।আসল ফুল যেমন অল্প সময়ের মধ্যে নষ্ট হয়ে যায়, কৃত্রিম ফুলে এই অসুবিধা না থাকায় সহজেই তা মানুষের কাছে গ্রহণীয় হয়ে উঠেছে। বর্তমানে মানুষ শুধুমাত্র ফুলের উপর নির্ভরশীল নয়, শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে ফুলের সঙ্গে ব্যবহৃত হয় নেটের,জরির কাপড়, চট, গাছের ছাল কিংবা থার্মোকল"।[২২]

মালাকার সম্প্রদায় সামাজিক সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন। হিন্দু পুরাণে কৃষ্ণের আশীর্বাদ পুষ্ট ছিলেন এই সম্প্রদায়ের বৃত্তিজীবী মানুষেরা। সমগ্র মধ্যযুগের পল্লীতে পল্লীতে ছিল এই সম্প্রদায়ের শিল্পী।ভোর থেকেই তাদের শিল্পকাজ নিয়ে মুখর থাকতেন তারা। R.V. Russell তাঁর 'The Tribes and Castes of the Central Provinces of India, volume 1' গ্রন্থে লিখেছেন- "With the village priests may be mentioned the mali or gardener. The Malis now grow vegetables with irrigation or ordinary crops,but this was not

apparently their original vocation. The name is derived from mala,a garland,and it would appear that the Mali was first employed to grow flowers for the garlands with which the gods and also their worshippers were adorned at religious ceremonies. Flowers were held sacred and were an essential adjunct to worship in India as in Greece and Rome." [২৩]

মালা :- লোকশিল্প সাধারণ উপকরণে তৈরী। বনজ ফুল,লতা,ফল,ফলের বীজ,নরম গাছের কাঠ প্রভৃতি উপকরণে মালা তৈরী হয়। লোকায়ত মানুষের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য সত্তার ফলশ্রুতি লোকায়ত শিল্প। মালা লোকায়ত মানুষের সৌন্দর্য চিন্তার এক অপরূপ শিল্প রূপায়ণ। মালা তৈরী করেন মালাকার সম্প্রদায়ের শিল্পীরা। মালাকারেরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদ ধন্য। রমণীরা এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। সমগ্র মধ্যযুগের সাহিত্য মালি এবং মালিনীর উল্লেখে ভরপুর। বিবাহ, দেবপূজা, নানা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, ধর্ম-কর্ম, সর্বোপরি শিল্পসুন্দর মনের প্রতিফলন ধরা পড়ে মালার সজ্জায়।

কবিকঙ্কণের কাব্যে যেমন বনমালা, পারিজাত মালা প্রভৃতি কুসুম শিল্পের উল্লেখ আছে। তেমনি আছে অক্ষয়মালা,তুলসীমালা, জাপ্যমালা এবং রুদ্রাক্ষমালার উল্লেখ। ধার্মিক, ঈশ্বরবিশ্বাসী মানুষদের ব্যবহৃত মালা এগুলি। বাংলাদেশ ধর্মপ্রাণ মানুষের আশ্রয়স্থল। শীলিত, সংস্কৃত, দেববাদে বিশ্বাসী মানুষদের জন্মভূমি এই দেশ। কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এই ধর্মপ্রাণ মানুষের ব্যবহৃত শিল্পের পরিচয় নিহিত আছে।

তুলসীমালা : - হিন্দু পুরাণে তুলসীর মাহাত্ম্যকথা সুবিদিত। সতী তুলসী দেবীরূপে পূজিতা। তুলসী গাছ তুলসীর প্রতীকী রূপ। লোকসমাজ, তুলসী গাছের আধ্যাত্মিক মহিমায় বিশ্বাস করে। গাছকে পূজা এবং দেবতা কল্পনার মধ্য দিয়ে সর্বপ্রাণবাদ,প্রকৃতিপ্রীতি, ভগবানের অশেষত্ব, গাছের মধ্যে আত্মার সন্ধান, সর্বোপরি মাঙ্গলিক রীতি নীতি,আচার ও সংস্কারের ঐতিহ্য অনুসন্ধান করা যায়।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে উল্লিখিত আছে, যে ব্যক্তি তুলসী কাঠের মালা গলায় ধারণ করেন, তিনি পদে পদে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করেন–

"তুলসীকাষ্ঠ নির্ম্মাণমালাং গৃহাতি যে নরঃ।

পদে পদেহশ্বমেধস্য লভতে নিশ্চতং ফল্ম "।[২৪]

তুলসী গাছের নরম কাঠকে সরু সুতোয় গেঁথে গেঁথে মালা তৈরী করা হয়। কবিকঙ্কণের কাব্যে তুলসীমালার উল্লেখ এসেছে বিভিন্ন স্থানে।আখেটিক খণ্ডে ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর অভিশাপ গ্রস্ত হয়েছেন। তিনি গলায় ধারণ করেছেন তুলসীমালা। কবিকঙ্কণ লিখেছেন–

"চৌদিকে বান্ধব মেলা গলায় তুলসী-মালা

গঙ্গাজলে করিল শয়ন"।[২৫]

বৈষ্ণবেরা তুলসী মালা বা তুলসীকাঠি গলায় ধারণ করেছেন। গুজরাট নগরে বৈষ্ণবেরা বসতি স্থাপন করেছেন। তাদের হাতে লাঠি আর গলায় তুলসীকাঠি–

"কাঁথা কমন্ডলু লাঠি গলায় তুলসী-কাঁঠি।"[২৬]

বণিক খন্ডেও সন্ন্যাসীদের গলায় তুলসী কাঠের মালা। কবিকঙ্কণ লিখেছেন–

"সুগন্ধী মল্লিকা দনা কিনত্র সকল জনা

তুলসীকাষ্ঠের কন্টমালা"।[২৭]

শ্রীমন্তকে সিংহলরাজের কোটাল শ্মশানে বলি দিতে চলেছেন। মৃত্যু পথযাত্রী শ্রীমন্ত কোটালকে অনুরোধ করছেন তাকে মুক্তি দিতে। কবিকঙ্কণ লিখেছেন–

"ছাড়হ কুন্তল পিঙ গঙ্গাজল

দেহ তুলসীর মালা"।[২৮]

বৈষ্ণবেরা যে তুলসীমালা পরেন, সেখানে তাদের ধর্ম, আচার, আচরণ এবং রীতি- নীতির পরিচয় পাওয়া যায়। গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ তাঁর 'প্রাচীন শিল্প পরিচয়' গ্রন্থে লিখেছেন–

"বিদ্যাধর ধৃত বচনে তুলসী কাষ্ঠ নির্মিত মালাধারণের উপদেশ পাওয়া যায়"।

নধায়স্তি যে মালাং তুলসী- কাষ্ঠ-নির্মিতাম্।

নরকান্ন নিবর্তন্তে দগ্ধা ক্রোধাগ্নিনা হরেঃ।

বৈষ্ণব সমাজে নানা শ্রেণীর কাষ্ঠমালার ব্যবহার দেখিয়া বোধ হয়, (.....) কালক্রমে তাহাই ধর্ম- কর্মের অঙ্গরূপেও পরিগণিত হইয়াছিল।"[২৯]

রুদ্রাক্ষমালা, অক্ষয়মালা , জাপ্যমালা : - রুদ্রাক্ষমালার মাহাত্ম্য হিন্দু পুরাণে বর্ণিত হয়েছে। পুরাণ মতে, রুদ্রাক্ষই ব্রহ্মার কন্যা সরস্বতী। রুদ্রাক্ষমালাকে জগতে শ্রেষ্ঠতম মালা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। রুদ্রাক্ষ শুভদায়ক, সিদ্ধিদায়ক। রুদ্রাক্ষ ধারণে লক্ষ্মীলাভ এবং বিদ্যালাভ হয়। 'শিবপুরাণ'এ রুদ্রাক্ষ মালা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, রুদ্রাক্ষমালা গলায় ধারণ করলে সকল পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়–

"তদ্দর্শনং তদা কৃত্বা গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ।

ত্রিপুন্ড্রকেন যুক্তঞ্চ রূদ্রাক্ষাভিঃ সমন্বিতম্"।[৩০]

রুদ্রাক্ষমালাকে অক্ষমালা বা জাপ্যমালাও বলা হয়। রুদ্রাক্ষ এক জাতীয় গাছ। সেই গাছের ফল থেকে মালা তৈরী করা হয়। পুরাণে বলা হয়েছে, ত্রিপুরা নামে অসুরকে বধ করার সময় শিবের চোখ থেকে যে অশ্রুবিন্দু ঝরে পড়ে,তা থেকে এই বৃক্ষের সৃষ্টি। রুদ্রাক্ষ জপমালা বলতে এই মালাকেই বোঝায়।

কবিকঙ্কণের কাব্যের দেবখন্ডে 'সরস্বতী বন্দনা' অংশে দেবী সরস্বতীর হাতে জাপ্য মালার উল্লেখ করেছেন কবি–

"শিরে শোভে ইন্দুকলা করে শোভে জাপ্যমালা

শুকশিশু শোভে বাম করে"।[৩১]

দেবী চণ্ডীর পূজায় ব্রাহ্মণেরা গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ধারণ করেন–

"রুদ্রাক্ষ কণ্ঠমাল পাইআ শুভকাল

পূজেন হেমবারি জোড়া"।[৩২]

বণিকখণ্ডে দৈত্যবধের সময়ে দেবী চণ্ডীর ক্রোধকে প্রজ্জ্বলিত করে দেবতারা নানা অস্ত্র দিয়েছেন। দক্ষ দিয়েছেন অক্ষয়মালা।

"কালদণ্ড হইতে যম দণ্ড দিল অনুপাম

দিল দক্ষ অক্ষয়মালা হাতে।"[৩৩]

বন্দী সাধু ধনপতি। বন্দীশালায় অসহায় তিনি।তবু গলায় ধারণ করেছেন অক্ষয়মালা। কবিকঙ্কণ লিখেছেন-

"জরুড় দক্ষিণ করে কুন্তল সকল শিরে

সদাই রুদ্রাক্ষ মালা গলে।"[৩৪]

হিন্দুর দেবদেবী, পূজা- পার্বণ, ব্রতকথা এবং ধর্মবিশ্বাসের অনেকটাই পুরাণ আশ্রিত। পুরাণে রূদ্রাক্ষমালাকে উচ্চতর মহিমা দেওয়া হয়েছে। হিন্দু ধর্মপ্রাণ বাঙালি বহু বৎসরের অধীত ঈশ্বর বিশ্বাসকে আত্মস্থ করেছেন। দৈনন্দিন জীবনযাপনে ঈশ্বর বিশ্বাসকে সম্পৃক্ত করেছেন। বাঙালির জীবন সাধনায়, পুরাণ এবং অলৌকিকতা নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মত মিশে গেছে।ভক্তি আশ্রিত,দেব পরিবেষ্টিত বাঙালির প্রতিনিধি ধনপতি অসহায় অবস্থায়ও গলায় পরেছেন অক্ষয় মালা।

আলপনা ও চিত্রকলা : - "আলিম্পন কথাটি পুরো সংস্কৃত, আর আলিপনা কথাটি পুরো চলতি বাংলা। আলিপনা বোঝায় সখীপনা করে ঘরের শ্রীবর্ধন করা, ক্রিয়া কর্মে সুচারুতা সম্পাদন করা। আলিপনা শব্দটি, এর মধ্যে পাঁচ সখীতে মিলে আলপনা দেওয়া, পিঁড়া চিত্র করা,তাও এসে পড়ে।"[৩৫]

কোনো জাতির অন্তরস্থিত সংস্কৃতি চেতনার বাহ্যিক প্রকাশ তার শিল্পকলায় ফুটে ওঠে। আলপনা কোনো প্রাণবন্ত জাতির সংস্কৃতির বহিঃস্থ রূপায়ণ, অন্তরস্থিত শক্তি, প্রাণপ্রেরণার উচ্চতম প্রকাশ রূপ। আলপনা ও চিত্রকলায় বাংলা ও বাঙালি জাতি আশ্চর্য অভিনবত্ব দেখিয়েছে। P.K. Maity তাঁর "Folk Ritual of Eastern India" গ্রন্থে লিখেছেন– "Alpana has attained its highest development in Bengal.It is used in this province on all occasions of religious and social ceremonies. It is, in fact, an auspicious object which often has magical import too.(.....)Social oceasions like marriage, first rice- eating, insvestiture with the sacred thread,and offerings to ancestors are also marked with the execution of Alpana as an essential part of the ceremony." [৩৬]

সেকালের পল্লীজীবনে আলপনার পরিসর অনেক দূর প্রসারিত। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে নানা স্থানে নানা চিত্রকলার পরিচয় আছে। কাব্যে অনার্য চিত্রকলা এবং আর্য চিত্রকলার বর্ণনা আছে।

অনার্য চিত্রকলা : - মধ্যযুগে বিবাহ উৎসবে আলপনা দেওয়ার রীতি ছিল। অনার্য অস্ট্রিক বেদেদের মধ্যেও এই শিল্পকলার লক্ষণীয় উৎকর্ষ লক্ষ করা যায়। বিশেষত সাঁওতালদের সৌন্দর্য সচেতনতা তাদের অঙ্কিত দেওয়াল চিত্রের মধ্যে বিশেষ ছাপ রেখে গেছে। কাব্যে দেখা যাচ্ছে,ফুল্লরার বিবাহ উৎসবের শুভক্ষণে এমন আলপনা দেওয়া হয়েছে। কবিকঙ্কণ লিখেছেন–

"গোমঞে লেপিয়া মাটি আলিপনা পরিপাটী

চারিদিকে বান্ধবের মেলা"।[৩৭]

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে আলপনা ও চিত্রকলার পরিচয় পাওয়া যায় নিম্নলিখিত ভাবে –

১)চিত্রমূর্তি (পৃঃ২৮) ২)পাষাণে পূজার পদ্ধতি লিখন (দেবদেবীর বাহনের চিত্র, পৃঃ২৮) ৩)আলপনা অঙ্কন (পৃঃ৪৩) ৪) দেবীর কাঁচলির চিত্র (পৃঃ৫৬) ৫)নানা চিত্র অঙ্কন (পৃঃ৭২) ৬)আলপনা অঙ্কন (পত্রিকার কলা গাছ পৃঃ১৩৫) ৭)দেওয়াল চিত্রে পুতুল অঙ্কন (পৃঃ১৬৫) ৮) পূজার আয়োজনে আলপনা (অষ্টদল পদ্ম পৃঃ১৪৭)।

[উপরিলিখিত লোকশিল্পের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি তথ্যসূচীতে উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে নেওয়া।][৩৮]

এছাড়া পট নির্মাতা সম্প্রদায়, যারা পটুয়া নামে অভিহিত তাদেরও পরিচয় দিয়েছেন কবি (পৃঃ৮৩)।

চিত্রকলায় অনার্য-আর্য সমন্বয় : দেবী ভগবতী কলিঙ্গ নগরে নিজের জন্য দেউল নির্মাণের কথা বলেছেন। হনুমানকে সঙ্গে নিয়ে বিশ্বকর্মা কাঁসাই নদের কূলে দেউল নির্মাণ করেছেন। নানা চিত্রশোভিত এমন দেউলে অঙ্কিত লোক চিত্রকলাগুলি হল দুর্গামূর্তি,বাহন ষাঁড় সহ শিবমূর্তি, বাহন ময়ূরের উপর অঙ্কিত কার্তিকের মূর্তি,মূষিকসহ গণেশমূর্তি। এগুলি সবই দেওয়াল চিত্র।এসব চিত্রকলা মধ্যযুগের লোকশিল্পে পুরাণ প্রবণতাকে প্রতিফলিত করেছে। এছাড়া পাষাণে লেখা দেবীদুর্গার পূজার পদ্ধতি।আর মন্দির সরোবর

দ্বারা বেষ্টিত চিত্রকলাও আছে। সর্বোপরি সরোবরকে বেষ্টন করে আছে ব্যাপ্ত উদ্যান।কবিকঙ্কণ লিখেছেন–

"নানা চিত্রমূর্তি কৈল বিচিত্র জগতি
হেমময় তথি আরোপিল ভগবতী।
কাঞ্চনের দুটী (বারি) বৃষভে মহেশ
মউরে কার্তিক লেখে-মূষিকে গনেশ।
হনুমান অভয়ার লইয়া অনুমতি
পাষাণে নিশান লিখে পূজার পদ্ধতি
....
পাষাণে রচিত কৈল চারিখান ঘাট
নানা চিত্রে রচিত কৈল পাষাণে নাছবাট"।[৩৯]

অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় আলপনাকে 'Ritual Drawing' বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর 'Folklore Of Bengal' গ্রন্থের 'Folk art's' অংশে লিখেছেন- 'Alpana or ritual drawings are the most remarkable specimens of the folk art of Bengal. It is solely a monopoly of women folk. (.....) the basic colour of the drawings is white, derived from powdered sun-dride rice'. [৪০]

আর্য চিত্রকলা ও আলপনা: মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের একটি বিশেষ রীতি ছিল দেবী বা নায়িকার কাঁচলিতে চিত্রাঙ্কন। মধ্যযুগের এই শিল্পকলা নারী সৌন্দর্যকে প্রতিভাসিত করে অন্য অনুভবে। সুদূর মধ্যযুগে সৌন্দর্যসত্তাকে এভাবে শিল্পমণ্ডিত করা হয়েছে।দেবীর কাঁচলিতে অঙ্কিত হয়েছে পুরাণের কথা। বিষ্ণু অবতার, প্রলয় সাগর, কুর্ম অবতার, বরাহ মূর্তি, বিষ্ণুর বামন মূর্তি ধারণ, বিষ্ণুর রাম অবতাররূপে জন্মগ্রহণ, যশোদানন্দন কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ, পুতনাবধ, কালীয়দমন খণ্ড, বৃন্দাবন খণ্ড, গোবর্ধনধারী কৃষ্ণ প্রভৃতি। আর কাঁচলির ডানদিকের চিত্রাঙ্কনে পায়রা, কপোত, গাঙ্গচিল, জাম্বুবান, হনুমানের চিত্র

অঙ্কিত হয়েছে। এছাড়া বৃন্দাবন, কদম্বকানন, দোলপিণ্ড, তালবন প্রভৃতি চিত্রকলা অঙ্কিত হয়েছে।

কবিকঙ্কণ লিখেছেন-

ক) "পায়রা কপোত লিখি লিখে গাঙ্গচিল

কুলিঙ্গ সালিকা ভেঠ টেঠারি কোকিল"।।[৪১]

খ) "লিখিল বরাহ কুর্ম ইকিড়া মুষিক।

জল জন্ত মকর লিখিল চারিদিক"।।[৪২]

বণিক খণ্ডে আর্য শিল্পকলার নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। আচার সংস্কারের সঙ্গে আলপনা সম্পৃক্ত।লহনা মন্ত্রপূত ঔষধ তৈরী করতে চান। তার জন্য বাড়ির উঠোনে পত্রিকার কলাগাছ অঙ্কন করেছেন। পত্রিকার কলাগাছ এখানে বিশেষ symbol হয়ে এসেছে। বিগত যৌবনা লহনা স্বামী সন্তোষের কারণে মন্ত্র গুণীর সাহায্য নিয়েছেন।সংস্কার এখানে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পত্রিকার কলাগাছ উদ্ভিজ্জ যৌবনের প্রতীক।

কবিকঙ্কণ লিখেছেন–

"পত্রিকার কলাগাছ রূপিবে অঙ্গনে।

ঘৃতের প্রদীপ তথি দিবে প্রতিদিনে"।।[৪৩]

আলপনায় Symbol : সেকাল পূজা পার্বণ এবং অনুষ্ঠানে আলপনা অঙ্কন করা হত।খুল্লনা চণ্ডী পূজা করেছেন। সঙ্গে দিয়েছেন আলপনা। কবি লিখেছেন–

"গোমঞে লেপি সদ্ম অষ্টদল পদ্ম

লিখিল সুগন্ধি চন্দনে" ।[৪৪]

আলপনায় ঐতিহ্যের পরম্পরা থাকে। শত শত বৎসর ধরে বাঙালি জাতি সংস্কৃত হওয়ার চেষ্টা করেছে। জাতিসত্তার কল্যাণ ও মাঙ্গলিক চেতনার স্ফুরণ ঘটেছে আলপনায়। আলপনা সামান্য অঙ্কন শিল্প নয়, আলপনা মোটিফ সম্বলিত চিত্রকলা। ভারতীয় মিথ এবং জীবন-যাপনের গভীরতম নির্যাস আলপনায় শিল্পিত রূপ পেয়েছে।

চণ্ডী পূজার জন্য খুল্লনা অষ্টদল পদ্মের আলপনা এঁকেছেন। বঙ্গ রমণীরা আতপ চাল গুলে আঙুলের বিন্যাসে এমন আলপনা অঙ্কন করেন। পদ্ম আলপনায় এক বিশেষ Symbol নিয়ে এসেছে। 'Dictionary of Symbols' গ্রন্থে পদ্মের আলপনা প্রসঙ্গে Jean Chevalier ও Alain Gheerbrant লিখেছেন–

"The lotus a Symbol from its rising out of darkness blossom in full sunlight." [৪৫]

পটশিল্প

মুকুন্দরামের কাব্যের উল্লেখযোগ্য বিষয় হল কাব্যে নানা চিত্রকলার উল্লেখ, ব্যবহার ব্যঞ্জনা ও সমাজনিষ্ঠ বিষয় তাৎপর্যের উপস্থাপন। আলপনা এবং দেওয়াল চিত্র মুকুন্দরামের কাব্যে বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এছাড়া মুকুন্দরামের কাব্যে পটশিল্পের উল্লেখ পাওয়া গেছে। সুদূর মধ্যযুগে পটুয়া বা চিত্রকরেরা পট আঁকতেন,পট ফিরি করতেন,গান করতেন। এভাবে পটুয়া সম্প্রদায় মধ্যযুগে এক বৃত্তিজীবী শিল্পী সম্প্রদায় রূপে জীবিকা নির্বাহ করতেন। কবিকঙ্কণের কাব্যে এই মুসলমান পটুয়াদের পরিচয় বিধৃত আছে। পটুয়াদের পদবী চিত্রকর। কিন্তু জাতিতে এরা মুসলমান। পটুয়ারা কাপড় থেকে জড়ানো পট,চৌকো পট, কাঁথা পট আঁকতেন। প্রথম দিকে তালপাতা,পরে কাপড় এবং কাগজে গ্রামীণ প্রাকৃতিক উপকরণে তৈরী রঙ-তুলি দিয়ে পট আঁকতেন পটুয়ারা। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার রেয়াপাড়া, নন্দীগ্রাম,হবিবচক,সুতাহাটার আকুবপুর এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পিংলা থানা এবং নয়াগ্রাম থানায় এখনও সামান্য হলেও পটশিল্প টিকে আছে।

কবিকঙ্কণের কাব্যের আখেটিক খণ্ডে কালকেতু গুজরাটে নগর পত্তন করেছেন। তিনি প্রজাবসতি করেছেন। বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং বৃত্তির মানুষেরা গুজরাটে জনপদ গড়ে তুলেছেন। এসেছেন পটুয়ারা। কবিকঙ্কণ লিখেছেন–

"পট লৈয়া ফিরে কেহ নগরে নগরে"।[৪৬]

লোকজীবন তখন জীবন্ত ও সরস ছিল। আধুনিকতার প্রলেপ সেখানে পড়ে নি। পটে হিন্দু দেবদেবীর চিত্র এবং পুরাণকথা স্থান পেত। ধর্মপ্রাণ বাঙালি দেববাদে বিশ্বাসী ছিলেন। এছাড়া কিছু সামাজিক পট আঁকা হত। মধ্যযুগে ধর্মীয় পট ছাড়া অন্য কোনো সামাজিক পটের চল কতটা ছিল তা নিশ্চিত করে বলা যাবে না।

বাংলার প্রাচীন পটে হরিনাম সংকীর্তন, গো-দোহনে যশোদা ও বালগোপাল,কৃষ্ণ-বলরাম, শিব ও পার্বতী প্রভৃতি বিষয় পাওয়া গেছে। 'বাংলার প্রাচীন চিত্র ও পট' প্রবন্ধে শ্রীরমেশ বসু লিখেছেন–

"বাংলার প্রাচীন শিল্পকলা একটা বিশিষ্ট পদ্ধতির ফল;একে বাদ দিলে ভারতীয় শিল্পের কোনোও বিবরণ বা ইতিহাস অসম্পূর্ণই থেকে যায়। [.....] পঞ্চদশ ও তৎপরবর্তী শতাব্দীগুলিতে কুণ্ডলী করে জড়িয়ে রাখা রামায়ণের চিত্র এবং কাগজ ও কাপড়ের উপর আঁকা নানা রকমের চিত্র বাংলাদেশে প্রচলিত হয়।শেষে ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ব্যঙ্গচিত্র পর্যন্ত পৌঁছে প্রাচীন শিল্পধারাটি একেবারে শুকিয়ে যায়।বৈষ্ণবেরা পাঁচ শতাব্দী ধরে একে খাঁটি হিন্দু ও জাতীয় শিল্পে পরিণত করে। তারপর বিজাতীয় ভাবের প্রাণ-নাশক বিষ-বাষ্পে জীবনশেষের কালটি ঘনিয়ে আসে"।[৪৭]

কাঁচলি ও পৌরাণিক চিত্রকলা : সংস্কৃত 'কঞ্চুলিকা' > প্রাকৃত কংচুলি > বাংলা কাঁচুলি। রমণীর বক্ষাবরণ হল কাঁচুলি। মধ্যযুগে অভিজাত রমণীদের বক্ষদেশ কাঁচুলির দ্বারা আবৃত থাকত। সাধারণ দেবদেবী এবং অভিজাত বণিক রমণীদের কাঁচুলি ব্যবহারের উল্লেখ মধ্যযুগের সাহিত্যে পাওয়া যায়। কাঁচুলিকে নানা ভাবে চিত্রিত করা হত। মনসামঙ্গল কাব্যে বেহুলার কাঁচুলির চিত্রাঙ্কনকে কবি বিজয়গুপ্ত চিরন্তন করে রেখেছেন। শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সেকালের বসন- ভূষণ' প্রবন্ধে লিখেছেন–"সেকালের বাঙালী মহিলার নানারঙের কাঁচুলির কথা সকল কাব্যেই দৃষ্ট হয়।..... কাঁচুলির চলন পশ্চিমের মত বঙ্গদেশেও ছিল, কারণ কবি কৃত্তিবাস হইতে ধর্মমঙ্গলের রূপরাম ঘনরাম পর্যন্ত সকলেই কাঁচুলির অল্প-বিস্তর বর্ণনা দিয়াছেন।ঘনরামের চিত্রিত কাঁচুলি রাজবাটির নমুনা দৃষ্টে রচিত সন্দেহ নাই।[৪৮]

কাঁচুলিতে নানা পৌরাণিক চিত্র অঙ্কিত হয়। কবিকঙ্কণের কাব্যে দেবী দুর্গার কাঁচুলি অঙ্কন করেছেন স্বর্গের বিশাই। কাঁচুলিতে বিষ্ণুর নানা অবতারের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। বিষ্ণু, কুর্ম, বরাহ, বামন প্রভৃতি অবতারের চিত্র কাঁচুলিতে অঙ্কিত হয়েছে। এছাড়াও পায়রা, কপোত, গাঙ্গচিল, কুমীর, হাঙর, রুই মাছের চিত্র, পৃথিবীর উৎপত্তি, প্রলয় প্রভৃতি চিত্র অঙ্কন করে বিশাই দেবী চণ্ডীকে দিয়েছেন।

কবিকঙ্কণ লিখেছেন–

"বিশাই কাঁচলি লেখে ভারতপুরাণ দেখে

লেখে নানা পুরাণের সার

....

আগে লেখে বিষ্ণু অবতার।

কাঁচলির বামভাগে লিখে বৃন্দাবন

পূর্বভাগে দোলপিণ্ডি কদম্বকানন

বিচিত্র কাঁচলি বিশাই দিল চণ্ডিকারে,

আশীর্বাদ পাইআ বিশাই গেল নিজ ঘরে"।[৪৯]

এমন কাঁচুলি সেকালের রমণীর সৌন্দর্যবর্ধন করে–

"বক্ষের কাঁচলি করে ঝলমলী

শোভিছে অঙ্গছটায়"।[৫০]

গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ তাঁর 'প্রাচীন শিল্প পরিচয়' গ্রন্থে 'অবগুন্ঠন' কে শিল্পরূপে চিহ্নিত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে 'অবগুন্ঠন' বস্ত্রশিল্পের অন্তর্গত।কাঁচলি অবগুন্ঠনেরই একরূপ। প্রাচীনকাল থেকে অবগুন্ঠন প্রথা ভারতীয় সমাজে চলে এসেছে। কাঁচলি শুধু রমণীর বক্ষদেশ আবৃত করে না, তার শিল্প সৌন্দর্যেরও উৎকর্ষ বর্ধন করে। গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ তাঁর 'প্রাচীন শিল্প পরিচয়' গ্রন্থে লিখেছেন–"অভিধানকার 'কঞ্চুক' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন–'মেয়েদের কাঁচলি'। মেয়ে মহলে ইহার যথেষ্ট ব্যবহার ছিল, তাহাতে সন্দেহ বা আপত্তি নাই। কিন্তু সীমন্ত সিন্দুরের মত ইহাতে মেয়েদেরই একচেটিয়া অধিকার ছিল বলিয়া স্বীকার করা যায় না। মধ্যযুগে অভিধানে কঞ্চুক অর্থে– 'চোল, কঞ্চুলিকা, কর্পাসক, অঙ্গিকা, কঞ্চুক অর্থে এই কয়টি শব্দ গৃহীত হইয়াছে।"[৫১]

রমণীর সৌন্দর্য তার বক্ষদেশের কাঁচলিতেও ঝলমল করে। মধ্যযুগের শিল্পকলায় পুরাণ প্রবণতা লক্ষণীয়। রমণীর বক্ষদেশের কাঁচলিতে পৌরাণিক চিত্র অঙ্কন বাংলাদেশের কলাশিল্পের একটা যুগকে চিহ্নিত করেছে।

প্রাচীনকাল থেকে শোলাশিল্পীরা সম্মান পেয়ে এসেছেন। মালাকার সম্প্রদায়ভুক্ত এই শিল্পীরা একালে প্রায় হারিয়ে গেছেন। বাংলার সামাজিক জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে

লোকায়ত মানুষের আচার আচরণ, জাতকর্ম, অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া, শুভ অনুষ্ঠান, মঙ্গল-আচরণ, বার-ব্রত-পার্বণ, দেব দেবীর পূজা অনুষ্ঠান। শত শত বছর ধরে বাংলাদেশে এসব শুভ অনুষ্ঠান সামাজিক প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ঠিক কবে থেকে এগুলি সমাজে চলে এসেছে, সেই সাল তারিখ সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। আমাদের পুরাতন বাংলা সাহিত্যে সামাজিক রীতিনীতির চিহ্ন থেকে গেছে। বাঙালির জাতীয় ইতিহাস নির্ণয় করতে হলে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যকে নতুন ভাবে অন্বেষণ করা দরকার। কবিকঙ্কণ বিশ্বকর্মার সন্তান সেই পুরাতন শিল্পীদের বরমাল্য পরিয়েছেন। সমাজ-সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রকৃত স্থপতি শিল্পীদের সম্মান জানিয়েছেন কবি। অনার্য অবহেলিত ব্রাত্য মানুষের অধিকার রক্ষায় মনোনিবেশ করেছেন। অপাংক্তেয় শিল্পীদের সাহিত্যে যথার্থ প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। মালাকারদের সৃষ্ট শোলার শিল্প, মালি, মালিনীদের কুসুমশিল্প এবং পটুয়াদের লোক চিত্রকলার উল্লেখ এসেছে কাব্যে। কুসুমশিল্পে নারী শিল্পীদের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। অনার্য রমণীরা ফুলমালায় শোভিত হতেন। আর্য রমণীরাও পরতেন ফুলমালা। লোকসম্প্রদায়ের শিল্প সৃষ্টিতে প্রয়োজন এবং সৌন্দর্য একান্তই পরস্পরাশ্রয়ী হয়ে দেখা দিয়েছে। কোনো জাতির অন্তরস্থিত সাংস্কৃতিক চেতনার বাহ্যিক প্রকাশরূপ তার শিল্পকলায় ফুটে ওঠে। লোকচিত্রকলা কোনো প্রাণবন্ত জাতির সংস্কৃতির বহিঃস্থ রূপায়ণ, অন্তরস্থিত শক্তি, প্রাণ প্রেরণা। আলপনা ও চিত্রকলায় বাংলা ও বাঙালি শিল্পীরা আশ্চর্য অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। বাঙালি জাতি সৌন্দর্যপ্রিয়। প্রয়োজন অতিরিক্ত সৌন্দর্যচর্চা বাঙালির সহজাত। বাঙালির গৃহকোণের আলপনা ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের ফসল। উৎসব-অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বণ, বার-ব্রত এবং যে কোনো শুভকর্ম ও মঙ্গল অনুষ্ঠানে আলপনা দেওয়া সাধারণ রীতি। অনার্য অস্ট্রিক বেদেদের মধ্যেও এই শিল্পকলার লক্ষণীয় উৎকর্ষ লক্ষ করা যায়। বাঙালির চিত্রকলায় অনার্য-আর্য সমন্বয় ধরা পড়েছে। চণ্ডীমঙ্গলের আখেটিক খণ্ডে কালকেতুর গুজরাট নগরে পটুয়ারা এসেছেন। ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের ফলশ্রুতি ছিল পটশিল্প। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে লোকচিত্রকলায় আলপনা, পট, চিত্র মূর্তি, পাষাণে পূজার পদ্ধতি লিখন, দেবীর কাঁচলির চিত্র, দেওয়াল চিত্রে পুতুল অঙ্কন,পূজার আয়োজনে আলপনা এবং অষ্টদল পদ্মের চিত্রের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। আলপনা অঙ্কনে সংস্কার এবং শুচিতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বণিক খণ্ডে লহনা মন্ত্রপূত ওষুধ তৈরীর জন্য পত্রিকার কলাগাছ অঙ্কন করেছেন। পত্রিকার

কলাগাছ Symbol হয়ে এসেছে। একালের সৌন্দর্যচর্চায় প্রাকৃতিক উপাদান কমে এসেছে। সৌন্দর্য চর্চায় এসেছে কৃত্রিমতা, কৃত্রিম ফুল হয়েছে গ্রহণীয়। স্বভাবতই বিশুদ্ধ লোকশিল্প ক্ষয়িষ্ণু হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তির প্রসার, সামাজিক পরিবর্তন, তথাকথিত শিক্ষিতদের লোকচিত্রকলা সম্পর্কে উন্নাসিকতা, লোকশিল্পীদের বৃত্তি পরিবর্তন লোকায়ত শিল্পের সর্বনাশকে ত্বরান্বিত করেছে। পুরাণে মালাকারদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদধন্য বলে বলা হয়েছে। বিষ্ণুপুরাণে পুরাণকার লিখেছেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মালাকারদের আশীর্বাদ করেছেন। মালাকার কৃষ্ণকে সুন্দর ফুল দিয়েছেন। বরপ্রদান করেছেন যে, কৃষ্ণের সৌন্দর্য কখনো মালাকারকে পরিত্যাগ করবে না। মালাকারের বংশবিলোপ হবে না। মালাকার দিব্যলোক প্রাপ্ত হবেন, মালাকারের বংশধরেরা দীর্ঘজীবী হবেন, কখনো আকস্মিক রোগের দ্বারা পীড়িত হবেন না। বিষ্ণুপুরাণে পুরাণকার লিখেছেন–

"ততঃ প্রহৃষ্টবদনস্তয়োঃ পুষ্পানি কামতঃ।
চারুণ্যেতান্যথৈতানি প্রদদৌ স বিলোভয়ন্।।
পুনঃ পুনঃ প্রণম্যাসৌ মালাকারো নরোত্তমৌ।
দদৌ পুষ্পাণি চারূণি গন্ধবন্তমলানি চ
মালাকারায় কৃষ্ণোহপি প্রসন্নঃ প্রদদৌ বরান্।
শ্রীস্ত্বাং মৎসংশ্রয়া ভদ্র ন কদাচিৎ প্রহাসতি।।
ধর্ম্মে মনশ্চ তে ভদ্র সর্ব্বকালং ভবিষ্যতি।
যুষ্মৎসন্ততিজাতানাং দীর্ঘমায়ুর্ভবিষ্যতি"।[৫২]

তথ্যসূত্র :

১. মিত্র, হীরেন্দ্রনাথ, বাংলার লোকউৎসব ও লোকশিল্প, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, শ্রাবণ ১৪২৩, পৃঃ২০৫

২. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ– ২০১৩,পৃ:- ৮২.

৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ২৭৬.

৪. ভট্টাচার্য, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ, বাঁশরী পত্রিকা, তৃতীয় বর্ষ, অগ্রহায়ণ–১৩৩২, সম্পাদক– নরেন্দ্রনাথ বসু, নীহাররঞ্জন সিংহ, পৃঃ ৪৪৮

৫. মজুমদার, কমলকুমার, বঙ্গীয় শিল্পধারা ও অন্যান্য প্রবন্ধ, দীপায়ন, কলকাতা, বৈশাখ–১৪০৫, পৃঃ ৯৫.

৬. মিত্র, হীরেন্দ্রনাথ, বাংলার লোকউৎসব ও লোকশিল্প, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, শ্রাবণ ১৪২৩, পৃঃ ২০২,২০৩.

৭. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ–২০১৩, পৃঃ ৬

৮. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১

৯. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৭

১০. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৮

১১. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩০৪

১২. ঠাকুর, বলেন্দ্রনাথ, শুভ উৎসব (প্রবন্ধ), বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, সম্পাদক– ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, মাঘ–১৪২২, পৃঃ ৪২১, ৪২২

১৩. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ–২০১৩,পৃঃ ২৮

১৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৭

১৫. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮২

১৬. হাজরা, প্রবালকান্তি, গ্রামীণ জীবনরাগের ঝিলিক, প্রভা প্রকাশনী, কলকাতা, বৈশাখ–১৪১৮, পৃঃ ১৪২

১৭. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ–২০১৩, পৃঃ ১০৬

১৮. পূর্বোক্ত

১৯. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২৪

২০. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২০

২১. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৭১

২২. শেঠ, সোমা, কুসুমশিল্প (প্রবন্ধ), লোকজ শিল্প (গ্রন্থ), সম্পাদক-বরুণ কুমার চক্রবর্তী, পারুল প্রকাশনী,কলকাতা, প্রথম সংস্করণ-২০১১, পৃঃ ৪১৭–৪১৮

২৩. Russell, R.V., 'The Tribes and Castes of the Central Provinces of India, volume -1'. CPSIA information can be obtained at www.jcgtesting.com, printed in USA BVHWOISO830231018, page – xxxi.

২৪. তর্করত্ন, পঞ্চানন (সম্পাদিত), ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রকৃতি খন্ডম, পৃঃ ১১০

২৫. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ–২০১৩,পৃঃ ৩৭

২৬. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮০

২৭. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪৫

২৮. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৬৭

২৯. বেদান্ততীর্থ, গিরীশচন্দ্র, প্রাচীন শিল্প পরিচয়, ভূমিকা– অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ-১৪২৫ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৬৬

৩০. তর্করত্ন, শ্রীপঞ্চানন, শিবপুরাণ : জ্ঞানসংহিতা, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, শ্রাবণ ১৪১৬, পৃঃ ১৪৪

৩১. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩, পৃঃ ২

৩২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩০

৩৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৬৩

৩৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৮৫

৩৫. ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ, আলিপনা (প্রবন্ধ), অবনীন্দ্র রচনাবলী(নবমখন্ড), প্রকাশ ভবন, কলকাতা, ১৪২৪, পৃঃ ৪৬৬.

৩৬. Maity, P.K., Folk Ritual of Eastern India, Appendices B,A note on Alpana, Abhinav Publications, New Delhi, P.– 131

৩৭. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩, পৃঃ ৪৩

৩৮. পূর্বোক্ত

৩৯. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৮

৪০. Bhattacharya Asutosh, Folk Arts: Folklore of Bengal, National Book Trust, India,2007, New Delhi, P.– 156

৪১. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ– ২০১৩, পৃঃ ৫৭

৪২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৭

৪৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩৫

৪৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪৭

৪৫. Chevalier Jean and Alain Gheerbrant, Dictionary of Symbols, Published by the Penguin group, Penguin Books Ltd,BO.Strand, London WCZRORL, England, 1996, P.– 617.

৪৬. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩, পৃঃ ৭৯

৪৭. বসু, শ্রীরমেশ, বাংলার প্রাচীন চিত্র ও পট, বিচিত্রা (পত্রিকা),শ্রাবণ ১৩৩৪, পৃঃ ২৫১, সম্পাদক- উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

৪৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকালীপ্রসন্ন, সেকালের বসন-ভূষণ, নারায়ণ,শারদীয় সংখ্যা, কার্তিক-১৩২২, পৃঃ ১৩৪৯, সম্পাদক-চিত্তরঞ্জন দাস

৪৯. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ- ২০১৩, পৃঃ ৫৬-৫৮

৫০. পূর্বোক্ত,পৃঃ ৫৯

৫১. বেদান্ততীর্থ, গিরীশচন্দ্র, প্রাচীন শিল্প পরিচয়, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ-১৪২৫ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ২৭

৫২. তর্করত্ন, আচার্য পঞ্চানন, বিষ্ণুপুরাণম্, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৪১৭, পৃঃ ৩৯৭, ৩৯৮